জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই ; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়
স্মরণে

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহারা প্রথমে প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গে রাজনীতিতে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু নিরালায় বসিয়া নানাভাবে ইহার রসদ জোগাইতে সচেষ্ট ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহকালে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও মাতাজী মহারানী তপস্বিনী[১] ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা অন্য ভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের গুণপনার পরিচয় দিতেছিলেন। রানী ভবানী, রানী রাসমণি, স্বর্ণময়ী, শরৎকুমারী, জাহ্নবী, দিনমণি, বিন্দুবাসিনী প্রমুখ বহু মহিলা জমিদারী পরিচালনায় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং সমাজসেবায় প্রতিনিয়ত যেমন তৎপর ছিলেন, তাহা যে-কোনো দেশের ও যুগের পক্ষেই শ্লাঘনীয়। বৃটিশরাজ তিলে তিলে এদেশবাসীদের অকথ্যভাবে শোষণ করিতেছিলেন, শাসনেও তাঁহাদের অনাচার প্রকট হইয়া পড়িতেছিল। এই পুঞ্জীভূত অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে 'শিক্ষিত' সমাজ যে সার্থক আন্দোলন পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন তাহাতে নারী ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করেন।

বঙ্গে হিন্দুমেলার ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর সর্ব বিষয়ে আত্মস্থ হইবার প্রয়াস প্রথমে সূচিত হয়। সে আজ সাতাশি বৎসর আগেকার কথা। তখনই স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের দিকে বাঙালির মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বদেশী শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শিতা দেখাইয়া বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা পারিতোষিক স্বরূপ পদকাদি প্রাপ্ত হন। ইহার পর স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে নারীসমাজের অন্তর্নিহিত সাজাত্যবোধ নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। ধর্ম সমাজ শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হন। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে কেহ কেহ রাজনীতিক্ষেত্রেও পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা তখন প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই,

১ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্বরাজ', ১৫ বৈশাখ, ১৩১৪

তাঁহারা অন্তরাল হইতে স্বামী-পুত্রদের নানারূপে সাহায্য করিতেন। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলাদেশে যে বিশেষ দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে রহিয়াছে নারীর এই কল্যাণহস্ত ও নীরব আত্মদান।

রাজনীতিতে বঙ্গনারীর যোগদান

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে (বোম্বাই ১৮৮৯) দুই জন বঙ্গনারী সর্বপ্রথম যোগদান করেন—কংগ্রেস-নেতা জানকীনাথ ঘোষালের সহধর্মিণী বাংলার 'সাহিত্যসম্রাজ্ঞী' স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যতম নেতৃস্থানীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। পর বৎসরের কলিকাতা কংগ্রেসেও ইঁহারা ঘনিষ্ঠতরভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এবারে উভয়েই প্রতিনিধিত্বের সম্মান লাভ করেন। কাদম্বিনী অধিবেশন-শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা করেন। অ্যানি বেসাণ্ট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারী জাতিরও উন্নতির দ্যোতক, এ ব্যাপারে তাহাই সূচিত হইল।[২]

কাদম্বিনী পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ না রাখিলেও অন্য নানা দিকে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যে মহিলাসম্মেলন হয় তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তারূপে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্সভালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯০৮ সনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইলে কলিকাতায় ইহার সাহায্যার্থ একটি সভা গঠিত হয়। কাদম্বিনী এই সভার সভানেত্রীরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিহারের কয়লার খনির মজুরানীদের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য তিনি কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে ১৯২২ সনে ঐ দুই প্রদেশ

২ "A symbol that India's freedom would uplift Indian womanhood."—*India Wrought for Freedom*, পৃঃ ১১৬

পরিভ্রমণ করেন। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মীদিগকেও তাঁহাদের মতবাদের বা নিজের বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানাভাবে সাহায্য করিতে কখনো পশ্চাৎপদ হন নাই।

বঙ্গের নারীদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী স্বদেশপ্রেম-মন্ত্রের একজন প্রধান উদ্গাত্রী। তাঁহার স্বদেশভক্তি শুধু সাহিত্যের ভিতর দিয়াই উৎসারিত হয় নাই, বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও তাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তৎপ্রতিষ্ঠিত সখীসমিতি বাংলার নারী-জাতির প্রাণে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ-বর্ধনে বিশেষ সহায়তা করে। সখীসমিতি পরে শিল্পাশ্রম ও বিধবাশ্রমে পরিণত হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা 'ভারতী'র অন্যতমা সম্পাদিকা হিরণ্ময়ী দেবী ইহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলন কালে স্বর্ণকুমারীর এই গানটি শতসহস্র নরনারীকে স্বাদেশিকতা-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল :

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম
মায়ের রাখিব মান— লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিধন।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

সরলা দেবী

স্বর্ণকুমারীর দেশভক্তি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীর ভিতরে যেন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী বি. এ. উপাধিধারিণী, গত শতাব্দীর শেষ দশকেই সাহিত্য-রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৫ সনে প্রবাসে থাকিতেই জ্যেষ্ঠা হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার লইয়াছিলেন। 'ভারতী'র মাধ্যমে তিনি প্রথমে স্বদেশবাসীদের বীর্যমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। 'মৃত্যুচর্চা' 'ব্যায়াম চর্চা' 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙালী জাতিকে সবল সুস্থ হইতে এবং অপমানের প্রতিকারার্থ মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে তাহাদের আহ্বান জানান। তিনি নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে ব্যায়াম কুস্তির কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। ইহার আদর্শে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে শরীরচর্চার আখ্ড়া প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসের অধিবেশনকালে যাহাতে ভারতীয় খেলাধুলার একটি প্রদর্শনী খোলা হয়, সেজন্য ১৯০২-৩ সনে তিনি একটি প্রস্তাব পাঠান। জাতীয় সংগীত রচনা দ্বারাও সরলা দেবী স্বদেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৯০১ সনে কলিকাতা কংগ্রেসে তাঁহার সুবিখ্যাত 'হিন্দুস্থান' শীর্ষক সংগীতটি গাহিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের ছাপ্পান্ন জন গায়ক মিলিত কণ্ঠে এই সংগীত গাহিয়াছিলেন। ইহার প্রথম স্তবকটি এই :

অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান!'
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান!'
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ সৌরভ পূরিত সেই নাম গান।
বঙ্গ বিহার অযোধ্যা উৎকল মাদ্রাজ মারাঠা গুর্জর নেপাল পাঞ্জাব
রাজপুতান্!

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে 'নমো হিন্দুস্থান!'

বন্দেমাতরম্ সংগীতটি কিছু অদল-বদল করিয়া নিজ প্রদত্ত সুরে ১৯০৫ সনের বারাণসী কংগ্রেসে সরলা দেবী গান করিয়াছিলেন।

সরলা দেবী বাঙালী জাতির মধ্যে স্বদেশগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মহারাষ্ট্রের শিবাজী-উৎসবের মত এখানেও প্রতাপাদিত্য-উৎসবের সূচনা করেন। ১৩১০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (ইং ১৯০৩, ১১ মে) ভবানীপুর কালীঘাট বালীগঞ্জ ও বাগবাজারের বালকসমাজ কর্তৃক সরলা দেবীর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইল। 'সঞ্জীবনী' 'বেঙ্গলী' 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্র ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় লিখিলেন :

As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a Hero for Bengal.

এই উৎসব হইতে অনুপ্রাণনা পাইয়া অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং নট ও নাট্যকার অমরচন্দ্র দত্ত 'প্রতাপাদিত্য' নাটক লিখিয়াছিলেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে 'উদয়াদিত্য'-উৎসব প্রতিপালিত হইল। রাজপুত বালক বাদলের মত বাঙালী বালক উদয়াদিত্যও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। বঙ্গসন্তানেরা এইসকল কথা নূতন করিয়া জানিয়া স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই আত্মগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

সরলা দেবী বীরাষ্টমী ব্রতের ভিতর দিয়াও বাঙালী জাতিকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন (১৯০৪)। দুর্গোৎসব কালে মহাষ্টমীর দিনে যুবকেরা তলোয়ারকে পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রত্যাপাদিত্য সীতারাম পর্যন্ত বীর ভারতসন্তানগণের নামে স্তোত্র পাঠ পূর্বক অঞ্জলি প্রদান করিত। শক্তিমন্ত্রের চিহ্নস্বরূপ এই দিনে মায়েরা নিজ নিজ সন্তানের হস্তে রাখী পরাইয়া দিতেন। নানারকম খেলাধুলারও আয়োজন করা হইত। ঐ উপলক্ষ্যে রচিত সরলা দেবীর 'বীরাষ্টমী গানে'র শেষ অংশ এখানে দেওয়া হইল :

স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে,
অতি মহাজ্ঞানী হোক না কেন,
তবুও সে জন অতি মহাজন
সার্থক জনম তাহার জেনো।
দেশহিত-ব্রত এ পরশমণি,
পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার
ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় আশু তার যায়
মরণে গোলোকে যায় সেই জন।[৩]

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বদেশজাত দ্রব্য সুলভে সরবরাহের আয়োজন হয়। ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর উদ্যোগে বৌবাজারে একটি[৪] এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে আর-একটি স্বদেশী ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন।[৫] সরলা দেবীও স্বদেশী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয়ার্থ "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" খুলিলেন। ১৯০৪ সনে বোম্বাই কংগ্রেস প্রদর্শনীতে এখান হইতে স্বদেশজাত বিবিধ দ্রব্যের নমুনা প্রেরিত হয়। এইসকল দ্রব্যের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার"কে একটি সুবর্ণপ্রদক প্রদান করিয়াছিলেন। সরলা

৩ 'ভারতী', কার্তিক ১৩১১।

৪ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই প্রবন্ধে : "Swadeshism and its contribution to Nationalism—Industrial, Cultural and Political"। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ২৫শ বার্ষিক সংখ্যা—*Journal of the College of Engineering and Technology, Jadabpur* পত্রিকায়।

৫ 'ভারতী', আশ্বিন ১৩০৭

দেবী লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' হইতে যেসকল সামগ্রী পাঠান হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। চট্টগ্রামের পার্বত্য রাজ্যের রানীর স্বহস্তের প্রস্তুত দুইটি অতি সুন্দর বস্ত্রখণ্ড বঙ্গদেশের গৌরবের কারণ হইয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' সুবর্ণ মেডেল পাইয়াছেন।" ৬

১৯০৫ সনের ৫ই অক্টোবর পঞ্জাবের আর্যসমাজী নেতা রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সরলা দেবীর বিবাহ হয়। ইহার পর প্রধানত পঞ্জাবই তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইল। এ সম্বন্ধেও একটু পরেই আমরা জানিতে পারিব।

স্বদেশী আন্দোলন

বড়লাট লর্ড কার্জনের হুমকিতে ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর (১৩১২, ৩০ আশ্বিন) বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। এই সময় বাংলাদেশ জুড়িয়া এবং বাংলার বাহিরেও যে স্বদেশীর অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার প্রস্তুতি চলিয়াছিল বহু বৎসর আগে হইতেই, আর এই কার্যে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব আদৌ কম নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাতেই নারীসমাজ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে রসদ জোগাইতে লাগিয়া গেলেন। তখনও কিন্তু প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে নারীর যোগদান তেমন শুরু হয় নাই। ঐ সময় তাঁহারা প্রধানত নিজ নিজ গৃহে, মহল্লায় বা পল্লীতে সমবেত হইয়া স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো-কান্দীতে এই দিনে পাঁচ শতাধিক মহিলা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভবনে সমবেত হইয়া তাঁহার রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শ্রবণ করেন এবং অরন্ধন পালন দ্বারা প্রত্যেকে স্বদেশী গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কলিকাতায় এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও নারীগণ পুরুষের সঙ্গে সমভাবে স্বদেশী-ব্রত পালনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। এ সময় বিদেশী দ্রব্য, বিশেষ করিয়া বিলাতী বস্ত্র, বর্জনের প্রতিজ্ঞায়ও তাঁহারা আবদ্ধ হন।

৬ 'ভারতী', ফাল্গুন ১৩১২।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের (পরে বসু) কার্যকলাপ ও ত্যাগ বিশেষ স্মরণীয়। তিনি এই সময়ে সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া এবং জাতীয় সংগীতাদি রচনা করিয়া জনসাধারণকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কুমুদিনীর মাতা লীলাবতী মিত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সুবালা আচার্য, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাস গৃহমধ্যে থাকিয়াই স্বদেশীকে সার্থক করিবার যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিজ নিজ গৃহে এবং পল্লীতে পল্লীতে তাঁত চরখা প্রবর্তনেও তাঁহারা তৎপর হন। হিরণ্ময়ী দেবী নারীদের স্বদেশী ব্রত গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের আরব্ধ দুইটি গঠনমূলক কার্যের কথা এইরূপ লেখেন :

"বিলাতী বস্ত্র যথাসাধ্য বর্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটি রমণী ৩০শে আশ্বিন হইতে আরও দুই-একটি বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শিল্পের সহিত জড়িত। যাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার আগে, অন্ততঃ একখানি শাড়ির পরিমাণ সুতা কাটিয়া তাহার দ্বারা শাড়ি তৈয়ারি করাইয়া সেই শাড়ি পরিয়া দেবতা প্রণামে যাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

"আর কয়েকজন রমণী একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম 'মায়ের কৌটা' রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছুই নাই, কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ। তাঁহারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটি মৃৎপাত্র বা যে-কোনো পাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃপক্ষে এক এক মুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। এটি এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা হইবে তাহা নহে— ইহাতে রমণীর আর-একটি গুরুতর কর্তব্য—সন্তান-শিক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাঁহার শিশু-সন্তানকে শিক্ষা দেন যে, প্রভাতে সর্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্মভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে এক মুঠা

চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম ও স্বদেশ ভক্তিরও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।"[৭]

দিকে দিকে স্বদেশীর বার্তা প্রচারিত হইতে লাগিল। স্বদেশী ব্রত গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গে জাতীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্যও নানা পন্থা উদ্ভাবিত হইল। বরিশালে মহিলাগণ বিবাহকালে শয্যা-তুলুনীর টাকা জাতীয়-ভাণ্ডারে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রাক্কালে (১৯০৬) 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহ রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির হইতে পারিবে না, এই মর্মে সরকারী নিষেধাজ্ঞা বাহির হইল। ইহা লইয়া সেখানে যে কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই সময় সরোজিনী বসু নাম্নী এক মহিলা প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হইলে তিনি দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণবলয় পরিবেন না। এই স্বর্ণবলয় তিনি বরিশালস্থ রাজা বাহাদুরের হাবেলীর প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ ভাণ্ডারে দান করেন।[৮] এই জন্য তাঁহাকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের মহিলারা অনেকে গৈরিক বসন পরিতে প্রতিজ্ঞা করেন—যতদিন না বঙ্গবিভাগ রহিত হয় ততদিন পর্যন্ত।

---

৭ 'ভারতী', পৌষ ১৩১২

৮ এই সংকল্পের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া সরোজিনী বসু নিজের পাঁচ বৎসরের পুত্র মারফত অশ্বিনীকুমার দত্তকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা এই :

'বন্দেমাতরম্'

পূজ্যপদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামণিকে দিয়া ডা'ন হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম্" বলা নিষেধি সার্কুলার রহিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ হাতে আর সোনার বালা পরিব না। "বন্দেমাতরম্।"

সেবিকা—শ্রীসরোজিনী বসু।

—"যজ্ঞভঙ্গ", পৃ, ১০৫

আবার কোথাও কোথাও মহিলাগণ অগ্রণী হইয়া স্বদেশী মেলা বা প্রদর্শনী বসাইতে উদ্যোগী হইলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সর্ববিধ সামাজিক ব্যাপারে—বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পূজা-পার্বণে এবং ব্রতাচরণে—বিদেশী বস্ত্র ও দ্রব্যাদি বর্জন যে এত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারও মূলে ছিলেন এই নারী। চব্বিশ-পরগনার মজিলপুরে একটি স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দুই জন মহিলা—বসন্তবালা হোম এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। সহকারী সম্পাদিকা রূপে তাঁহারা শিল্প-দ্রব্যাদি সংগ্রহে যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, প্রথমোক্ত মহিলার মুখে তাহা শুনিতে পাইয়াছি। এই প্রদর্শনীর সম্পাদক ছিলেন 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক ও সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত।

বাঙালীর মনোরাজ্যে যে ভাবপ্লাবন আসে তাহার মূলেও মহিলা-কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা কম ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকাগণের সংগীত কবিতা প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি ক্রমশ প্রকাশিত হইয়া নরনারী নির্বিশেষে বাঙালী মাত্রকেই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করে। বাংলার নারীসমাজ স্বদেশী প্রচেষ্টায় যে কতখানি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহার পরিষ্কার উল্লেখ পাই ১৯০৬ সনের ২৯ ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন সময়ে বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী বরোদার মহারানী চিমনবাঈএর অভিভাষণে। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন যে, উত্তর ভারতে পঞ্জাব, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুরে যে স্বদেশী মনোভাব এতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা এই স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে, আর এই আন্দোলনের মূলে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব রহিয়াছে অনেকখানি।[৯]

---

[৯] "I know how the ladies of Bengal have helped and supported the Swadeshi movement which is now spreading fast over Northern India and the Punjab, over Gujrat and the Deccan, over Madras, Mysore, and Travancore, everywhere over this continent."

মহারানী এই আশা পোষণ করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ অবিলম্বে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইবে।

নারী ও বিপ্লবী দল

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক কর্মীদের ভিতরে মডারেট বা নরমপন্থী এবং এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী এই দুই দলের উদ্ভব হয়। এই দুই দল ব্যতীত বিপ্লবপন্থী এক দলও এ সময় আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্লববাদ বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতে থাকে। ডক্টর শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি সাম্প্রতিক রচনা হইতে জানিতে পারি, একজন মহিলাও বিপ্লববাদের মূলে প্রথম অবস্থায় রসদ জোগাইয়াছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন, বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভারতগতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ এবং বঙ্গভূমিকে কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্গনারীর কথা বলিবার সময় তাঁহার বিষয় উল্লেখ না করিলে কাহিনী অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বঙ্গদেশে যে পাঁচ জন সভ্য লইয়া 'Revolutionary National Council' বা ভারতীয় বিপ্লব সমিতি গঠিত হয় এবং যাহার একজন প্রধান সদস্য ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। পুস্তকে এবং বক্তৃতায় তিনি যেমন জাতীয়তার ভিত্তিমূলের কথা প্রকাশ করিতেন তেমনি বিপ্লববাদ প্রচারেও রত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের মূলেও এই কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। ১০৮নং আপার সারকুলার রোডের বিপ্লব-কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটি ১৯০২ সনের শেষে বা ১৯০৩ সনের প্রথমে নিবেদিতা প্রদত্ত পুস্তকসংগ্রহ দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল। তিনি এইখানে কোনো কোনো বিষয়ে যুবকদের নিকট বক্তৃতা প্রদান করিতেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুইটির মাধ্যমে নিবেদিতা বাংলার যুব সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন।

বঙ্গের নারীসমাজে তখনই নিবেদিতার প্রভাব অনুভূত হইতেছিল। বরিশালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সেখানে গমন করেন এবং নারীদের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে ও ব্যবহারে তৎপর হইতে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন। আর্থিক সংস্থানের উপায় স্বরূপ পুনরায় চরকা গ্রহণে নারীদের উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি সেই স্বদেশী যুগেই। স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে বিপ্লববাদের আদর্শে যখন কাজ শুরু হয়, তখনও তিনি ইহাতে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।[১০] বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য তিনি যেন সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, একটি ঘটনা হইতে

১০ বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ সম্পর্কে Lizelle Reymond *Nivedita—Fille de L' Inde* শীর্ষক ফরাসী ভাষায় লিখিত জীবনীতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার কিয়দংশের ইংরেজি তাৎপর্য এই :

She (Nivedita) taught them first the mechanism of secret societies, such as Ireland had known. These samities existed already plentifully in the Indian villages, but they remained fragmentary. There still remained a step to make them a fare so active that each man should represent the entire group and become responsible to the entire group and become responsible for the honour of all.

Then Nivedita insisted on the absolute security of the immense network of secret communication stretched throughout the country like the protecting spider's web. It was necessary that orders should be transmitted as rapidly as by post, from man to man by signs and messages learnt by heart. The appeal was heard. The couriers allowed themselves to be butchered rather than let themselves be corrupted. The ends assigned were pursued with a devotion almost superhuman. From one village to another the cry re-echoed "we are ready."...

"Money was necessary, much money," said Nivedita. All the money that fell into her hands was distributed into the villages by Barindra Kumar Ghose, some women carrid to her their jewels, some princes a part of their revenue, some zeminders their harvest, some employees their salaries, some merchants bushels of grain. Some works of inter-aid were born spontaneously, because the moral body of India had now nerves, muscles, blood. When one member suffered, the whole country came to her aid.

তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৭ সনে 'যুগান্তরে'র সম্পাদকরূপে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হইলে তাঁহাকে জামিনে খালাস করিবার নিমিত্ত নিবেদিতা স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত হন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে জামিন দাঁড়াইতে হয় নাই।

ভূপেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিপ্লবকার্যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আজ সর্বজনবিদিত। 'যুগান্তরে' বিপ্লববাদ-প্রচারের অভিযোগে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে ১৯০৭ সনের ২৪ জুলাই তারিখে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই কিংসফোর্ডই আদালতে সুশীল সেনের উপর বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। ইঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার সমস্ত বিপ্লবপরিকল্পনা সূচনাতেই ফাঁস হইয়া যায়। ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড বাংলার রমণীকুলের প্রাণেও তীব্রভাবে বাজিয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণ স্বাধীনতার জন্য কিরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে—ভূপেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মাতা ভুবনেশ্বরীকে মহিলাগণ প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র হইতে তাহা জানা যায়। ডাঃ নীলরতন সরকারের ভবনে কলিকাতার নেতৃস্থানীয়া দুই শত মহিলা স্বদেশী নেতা 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী লীলাবতী মিত্রের পৌরোহিত্যে একটি সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের সহধর্মিণী সুবালা দেবী ইহা পাঠ করিলেন। অভিনন্দনপত্রখানি এই :

"যতোধর্মস্ততো জয়ঃ।"

"সময়োচিত সম্ভাষণ পুরঃসর নিবেদন,

"আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেক বঙ্গনারী অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি। পতিত জাতি ক্ষীণ পুণ্য হৃত ধর্ম ও লুপ্ত গৌরব পুনরায় লাভ করিতে গিয়া পদে পদে যখন তীব্র অপমান ভোগ করেন, তখন সে নিগ্রহ উজ্জ্বল মণির ন্যায় জাতীয় জীবনের শোভা বর্ধন

করিয়া থাকে। বিধাতার শুভ বরে আপনার পুত্র অদ্য যে স্পৃহনীয় আভরণ অর্জন করিয়া আনিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে কেবল আপনার কুল নহে—সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছে। এরূপ সন্তানের জন্মে কুল পবিত্র, জননী ধন্যা ও জন্মভূমি আলোকিত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক স্বদেশ-সেবক পুত্র প্রতি বঙ্গনারীর অঙ্কে অবতীর্ণ হউন, এই আশীর্বাদ অদ্য আমরা বিধাতার নিকট ভিক্ষা করিতেছি। ইতি ২৪শে শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।

সমবেত বঙ্গমহিলাগণ।

৬১নং হ্যারিসন রোড।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাব্যঞ্জক সংগীত এবং আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু বিরচিত একটি কবিতা এখানে পঠিত হয়। একটি রৌপ্যাধারে অভিনন্দন-পত্রখানি স্থাপন করিয়া ভূপেন্দ্র-জননীকে অর্পণ করা হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল

সরকারের অনাচারে নারী-জাতির মধ্যেও বিপ্লবের আদর্শ প্রচারিত হইতে সুযোগ পাইয়াছিল। তখনও আধুনিক শিক্ষা তাঁহাদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে নাই। তথাপি স্বাধীনতার মন্ত্রে বঙ্গনারীও উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুতে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পত্নী হেমাঙ্গিনী দাস এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সঙ্গে নিমতলা শ্মশানক্ষেত্রে যাইয়া মৃতের পদরজ মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব যে নারীজাতির, বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের, মধ্যে স্বদেশভক্তির উদ্রেক করিতে সহায় হইয়াছিলেন তাহা স্বল্প কথায় ব্যক্ত করিলেন। ২৪ আগষ্ট ১৯০৭ তারিখের ইংরেজী 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক এবিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন।[১২] কখনো

১১ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত 'নবশক্তি', ১৩ আগষ্ট ১৯০৭

১২ "And lastly when a few disconsolate ladies waded through the crowd like apparitions and touched the sacred tenement of that great

বিচারে, কখনো বিনা বিচারে বাংলার নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মিগণকে আটক করায় অন্তঃপুরবাসিনীরাও ইংরেজ সরকারের উপর তীব্রভাবে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠেন। তাঁহারা স্বদেশী ব্রত পালনে অধিকতর কৃতসংকল্প হইলেন। পরবর্তীকালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেমস ম্যাক্‌ডোনাল্ড ১৯০৯-১০ সনে পত্নী সমভিব্যাহারে ভারত-পর্যটনে আগমন করেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড-পত্নী বঙ্গদেশে নারীদের অবস্থা এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রচেতনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বঙ্গনারী কায়মনে যোগদান করিয়া বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন—বঙ্গ-নারীর এই স্বদেশভক্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।[১৩] স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজের কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪]

এ সময় নারীদের মধ্যে আর-একটি কার্যেরও সূচনা হইল। ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির যোগ না থাকিলেও পরবর্তী যুগের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে

---

soul, the whole crowd was overcome by feelings which were never experienced before. The brief funeral speech of the more elderly among them had an unspeakable eloquence. It moved the whole crowd to tears. She had referred to the part he had played in arousing Indian womanhood.

১৩ "Secondly, one feels there is a tremendous movement going on amongst the women. We are fond of labelling the Indian aspirations as *sedition*, when if they were amongst ourselves we should call them *patriotism*. This movement seems to be spreading as much amongst the women as amongst the men."—*The Modern Review* for August 1910

১৪ "The women are craving for education, and to take some part in the movement of affairs. Take for instance the Swadeshi movement. This could not have succeeded in the way it has done without women. They have meetings in each other's houses, and determine only to buy goods made at home, and not to buy goods made by foreigners.

"The women in the Zenanas often do not know how to read or write, but in spite of this the Swadeshi movement is spreading very much in the places where one would hardly think there would be opportunity for its growth,"—*Ibid.*

বাংলার নারীসমাজে যে ত্যাগ ও সেবার প্লাবন বহিয়াছিল ইহা তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যায়। ১৯১০ সনে এলাহাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনকালে, ৩০ ডিসেম্বর তারিখে পঞ্জাব-প্রবাসিনী বঙ্গকন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী মহিলা-সম্মেলনে 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি বিষয়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ইহাতে যে আয়োজন হইল তাহা কখনও ভুলিবার নয়। বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা হইলেন প্রাতঃস্মরণীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস, আর পঞ্জাব শাখার সম্পাদিকা হইলেন সরলা দেবী চৌধুরানী স্বয়ং। সরলা পঞ্জাব শাখার মারফত রাষ্ট্রে নারীর অধিকার নিরূপণ বিষয়েও আলোচনা করিতে শুরু করিয়াছিলেন। এতাদৃশ আলোচনার ফলেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীর স্থান ক্রমে সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে।

স্বদেশীর মরশুমে বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া সরকার যে নির্যাতন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে কখনও ছেদ পড়ে নাই। ইহার ফলে বিপ্লবকার্য বাংলার জলমাটিতে একেবারে শিকড় গাড়িয়া সমগ্র ভারতে পল্লবায়িত হইল। এই সময় বঙ্গনারীর মধ্যেও যে দেশভক্তি পূর্ণমাত্রায় দেখা গিয়াছিল, বিদেশিনী ম্যাক্‌ডোনাল্ড-পত্নীর চক্ষে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। নিরক্ষর বঙ্গবালাও স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। তখনকার দিনে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে তাঁহাদিগের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব ছিল না বটে, তবে তাঁহারা যে ইহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন, উক্ত বিদেশিনী তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরের সময় বিপ্লবীদের কার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। ফেরারী বা পলাতক কর্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল রিভলবার রাখা বা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যম রূপে কাজ করা—কোনো কোনো বিপ্লবী পরিবারের মেয়েরা স্বেচ্ছায়ই এসকল করিয়া যাইতেন। ১৯১৬ সনে বীরভূম জেলার সিউড়ীতে দুকড়িবালা নাম্নী এক মহিলার বাড়িতে মসার ('mauser') পিস্তল পাওয়া

যায়। তিনি তখন সরকারের নিকট 'সিন্ধুবালা' নামে পরিচিত হন। বিচারে তাঁহার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপোগণ্ড শিশুদের গৃহে রাখিয়া তিনি কারাগারে আশ্রয় লইলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী জেল হইতে তাঁহার স্বামীকে যে প্রথম পত্র লেখেন তাহা এই :

"আমি বেশ আছি। কিছুই ভেব না আমার জন্যে। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবে। বাচ্চাদের ভুলিয়ে রেখ। তারা মা মা করে কাঁদলে আমি এখানেই চঞ্চল হয়ে উঠব। প্রণাম নিয়ো। ইতি—সেবিকা দুকড়িবালা।"[১৫]

দুঃখময়ী নাম্নী আর একজন মহিলাকেও অনুরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সরোজিনী নাইডু

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সময় আর-একজন বঙ্গকন্যার আবির্ভাব সত্যসত্যই একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি উচ্চশিক্ষিতা, ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্না এবং সুকবি। পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল হায়দরাবাদে নিজামের অধীনে শিক্ষাবিভাগে কর্ম করিয়া কলিকাতায় অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু কন্যা সরোজিনী জনৈক দক্ষিণী চিকিৎসকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রবাসেই রহিয়া গেলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সরোজিনী নাইডুর নাম আজ ভারতবর্ষে কে না জানে? তিনি সাক্ষাৎভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৯১৫ সনে বোম্বাই অধিবেশনে। এই বৎসরই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রস্তাবের সমর্থনে সেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৯১৭ সনে অ্যানি বেসাণ্টের সভানেত্রীত্বে কলিকাতা কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতেও তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা

১৫ ''নমামি', শ্রীজিতেশ লাহিড়ী, পৃ ৩০

করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটির মর্ম এই, "বিপদে আপদে ভারতের নারীজাতি সবসময়ই পুরুষের সহায়। পুরুষ যখন অবসন্ন বিভ্রান্ত, তখন নারীই আলোক-বর্তিকা-হস্তে তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিবে।"

নিখিল-ভারত মোস্‌লেম লীগ অধিবেশনে মৌলনা সৌকৎ আলী মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মুক্তিপ্রস্তাবের সমর্থনেও এই সময় সরোজিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিলক-বেসাণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোমরুল-আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। শাসনসংস্কারের প্রাক্কালে হোমরুল প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি ১৯১৮ সনে বিলাতে গমন করেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী সভার সম্মুখে নারীর ভোটাধিকার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি পেশ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেরই মে মাসে কাঞ্জিভরমে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ প্রাদেশিক সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে তিনি আহূত হন। তাঁহার মৌখিক ভাষণ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার ভগিনী মৃণালিনীও বেসাণ্টের সহযোগীরূপে মাদ্রাজে রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত হইলেন। 'সাম্‌-আ' পত্রিকার সম্পাদক-রূপে মাদ্রাজ-বাসীদের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারে তিনি তৎপর হন।

রাজনীতির নূতন রূপ

প্রথম মহাসমর অন্তে ভারতবর্ষের রাজনীতি আবার জটিল আকার ধারণ করে। ভারতবাসীর নবজাগ্রত স্বাধীনতা-স্পৃহা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সুস্থ থাকিতে দেয় নাই। রৌলট আইন পাস করিয়া ইহার গতিরোধে তাঁহারা চেষ্টিত হইলেন। এবারেও কিন্তু জাতি নতশিরে ইহা গ্রহণ করিল না। স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশের মধ্যেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এবারে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। ইহার প্রতিরোধে সরকার যথারীতি অগ্রসর হইলেন। ফলে নানাস্থানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মহাসমরের সময়ে ও'ডায়ারী শাসনে পঞ্জাববাসী তিক্তবিরক্ত হইয়াই ছিল।

সত্যাগ্রহের ভিতরে তাহারা বন্ধনমুক্তির আভাস পাইয়া নূতন আশায় একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে উভয় পক্ষেই কিছু কিছু অনাচার হইল। কিন্তু সরকার পক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক আইন প্রবর্তন পূর্ববর্তী সকল অনাচার-উৎপীড়নকেই ছাড়াইয়া যায়। পঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত হইলেন। পঞ্জাবের অন্যতম নেতা রামভজ দত্ত চৌধুরীও নির্বাসিত হন। বঙ্গকন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী অসীম ধৈর্য সহকারে উৎপীড়িত পঞ্জাববাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই সময়কার ত্যাগ সেবা ও দুঃখবরণ প্রবাসে বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তিনি একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এখানি প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিকে পরিণত হয়। সরকারী রোষ হইতে ইহা রেহাই পাইল না।

পঞ্জাবের অনাচারে সমগ্র ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করিলেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতব্যাপী বিক্ষোভকে সুপথে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সনে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতবর্ষের তথা বঙ্গের নারীজাতির মুখপাত্রীরূপে সরলা দেবী চৌধুরানী গান্ধীজীর প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তিনি ইহার সপক্ষে নারীজাতির ইতিকর্তব্যও নির্দেশিত করিলেন। এই সময় সরোজিনী নাইডু স্বাস্থ্যোন্নতি-মানসে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে তিনি পঞ্জাবের সরকারী অত্যাচার সম্বন্ধে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দেন। ইহার ফলে সেখানেও কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ভারতসচিব মণ্টেগু এবং সরোজিনীর মধ্যে পত্রের মারফতে বিতর্ক চলিতে থাকে। নাইডু মহোদয়া কংগ্রেস-রিপোর্ট হইতে পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে যথাযোগ্য প্রমাণ দেখাইলে তবে মণ্টেগু সাহেব নিরস্ত হন। ১৯২০ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের-বিশেষ অধিবেশন এবং নাগপুরে বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতে

জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন পর্যায় আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলার নারীকুলও ইহাতে কায়মনে যোগদান করেন।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে (১৯২০) স্বেচ্ছাসেবিকা রূপে বাংলার মেয়েদের কৃতিত্ব এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর নেত্রীরূপে উচ্চশিক্ষিতা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর সাক্ষাৎভাবে যোগদানের দ্যোতক ইহাই।

অসহযোগ-প্রচেষ্টা

নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২০) অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হইলে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলায় ফিরিয়া আইনব্যবসা ছাড়িয়া দেন এবং আন্দোলনে একান্তভাবে যোগদান করেন। দেশের জন্য সর্বত্যাগী হইয়া চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' হইলেন। বাংলাদেশের সর্বত্র স্বরাজ-লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল তাহাতে বঙ্গের নারীসমাজও বিশেষ উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করিলেন। কংগ্রেস-স্থাপিত তিলক-স্বরাজ্যভাণ্ডারে বাসন্তী দেবীর অনুপ্রাণনায় নানা স্থানে মহিলাগণ গহনা ও টাকাকড়ি দান করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন শহরে ও পল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে নারীগণ প্রকাশ্যে আসিয়া যোগ দিলেন। সুদূর পল্লীতেও অসহযোগের সাড়া কিরূপ পড়িয়াছিল, এবং নারীগণ সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইয়া কংগ্রেস-সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া ও স্বরাজ্য ভাণ্ডারে যথাসামর্থ্য দান করিয়া কিরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন লেখক নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

কলিকাতায় যখন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হইল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ নেতৃবৃন্দসহ দলে দলে কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন তখন বঙ্গের

নারীগণ আসিয়া পুরুষের স্থান পূরণ করেন। আর এবিষয়ে পথপ্রদর্শক হন দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁহার ভগিনী শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী এবং শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী। ১৯২২ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁহারা আইন অমান্য করিয়া খদ্দর বিক্রয়ের জন্য রাস্তায় বাহির হইলে পুলিস তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে এবং রাত্রি ১২টার সময় ছাড়িয়া দেয়। অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনে বঙ্গে এই প্রথম নারী গ্রেপ্তার হওয়ায় তখন বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। ইহার পরে অবশ্য অনেকেই তাঁহাদের পথানুগামিনী হইয়াছিলেন।

অসহযোগের মরশুমে শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় গঠনমূলক কার্যের নিমিত্ত নারী-কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রচার, চরকার প্রচলন এবং গৃহে গৃহে খদ্দর বিক্রয়— এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া ইহা গঠিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ (৭ ডিসেম্বর ১৯২১) এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কারারুদ্ধ হওয়ায় রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার ভারও নারী-কর্মমন্দিরের উপর পতিত হইল। কলিকাতায় সভা-সমিতি করা বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর নেতৃত্বে নারী-কর্মমন্দির আইন অমান্য করিয়া সভা-সমিতি করার ভার লইলেন। কুমিল্লা হইতে আগত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা বসন্তকুমার মজুমদারের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার নারী-কর্মমন্দিরের কর্মীরূপে ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। প্রায় তিন সপ্তাহ কার্য করিবার পর উর্মিলা দেবী অসুস্থ হইয়া পড়িলে হেমপ্রভার উপর সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের ভার পড়িল। পুলিসের লাঠি ও সার্জেণ্টের বেটন অগ্রাহ্য করিয়া হেমপ্রভা উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় সভা-সমিতির আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোলদিঘিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি সার্জেণ্টের বেটনের আঘাতে আহত হন। তিনি এই সময়ে, এবং বিশেষ করিয়া এই দিনে, যে ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দেন তাহা অনেককে চমক লাগাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর-একজন প্রবীণা মহিলার কথাও উল্লেখ করিতে হয়।

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী বার্ধক্যে যুবসুলভ উৎসাহ লইয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করেন। নগ্নপদে বাড়ি বাড়ি খদ্দর বিক্রয়, সভা-সমিতিতে গমন, বক্তৃতা দান, এমনকি মফস্বলে যাইয়া স্বরাজের বার্তা-প্রচার— কোনোটিতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। মফস্বলে, বিশেষতঃ মেদিনীপুরের কাঁথিতে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরিচালিত ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের উদ্দেশ্যে কর-বন্ধ আন্দোলন তখন যে এত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার মূলেও রহিয়াছে সেখানকার তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ স্বদেশবৎসল নারীসমাজ। ১৯২২ সনে চাঁদপুরে 'কুলি' নিগ্রহ এবং স্টিমার-ধর্মঘট কালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার অপূর্ব ত্যাগ সেবা এবং কর্মকুশলতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রিয়র সকল কার্যেই শ্রীযুক্তা নেলী সহায় ও উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। স্টিমার-ধর্মঘট কালে বসন্তকুমার মজুমদার ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা ধর্মঘটকারী এবং আসাম-প্রত্যাগত চা-বাগানের 'কুলি'দের সেবা-শুশ্রূষার জন্য গোয়ালন্দে ছয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর কারাগমনের পর বাসন্তী দেবী বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-পদে বৃতা হন। ১৯২২ সনের ১৫ ও ১৬ এপ্রিল চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বাসন্তী দেবীরই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইল। তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-প্রস্তাব খানিকটা সংশোধন করিয়া কাউন্সিল-প্রবেশকেও ইহার অঙ্গীভূত করিবার কথা উত্থাপিত করেন।[১৬] ইহা লইয়া তখন যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহারই পরিণতি হয় স্বরাজ্য-

---

১৬ অভিভাষণের উক্ত অংশটি এই: "এই সমস্ত কার্যের সুবিধার জন্য চারিদিকে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। ইউনিয়ন কমিটি, লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি এই সকল সমিতির সাহায্যে নিজেদের হাতে আনিতে হইবে এবং সেইগুলির সাহায্যে জাতীয় ভাব প্রচার করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে কাউন্সিল পর্যন্ত দখল করিতে হইবে। কাউন্সিলে আসিয়া অসহযোগ-আন্দোলন পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। যতদিন না আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করা হয়, ততদিন ভালমন্দ সমস্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে বাধা দেওয়াই হয়ত আমাদের কাউন্সিলের কাজ হইবে। ভরসা করি জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে এই বিষয় ভাল করিয়া বিবেচিত হইবে।"

আন্দোলনে ও স্বরাজ্য-দল প্রতিষ্ঠায়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং দেশবন্ধুও কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। দার্জিলিঙে সাবিত্রী দেবীর রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত হইবার কথাও সভানেত্রীর অভিভাষণে উল্লিখিত হয়।

অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ হইবার দুই বৎসর পরেই ইহার কার্য অনেকটা থামিয়া যায়, কিন্তু এই সূত্রে ভারতীয় সমাজে যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হয় তাহা সর্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিকারে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশে তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয় এই একই কারণে। নারী-পুরুষ অনেকেই ইহাতে যোগ দিয়াদিলেন। নারীদের মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখ করিতে হয়। ইতিপূর্বে উভয়েই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সন্তোষকুমারী ইংরেজি বাংলা হিন্দী তিনটি ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়া শহর পল্লী সর্বত্র জনগণকে মাতাইয়া তোলেন। তিনি ছিলেন রেঙ্গুন-প্রবাসী। অ্যানি বেসান্টের কর্তৃত্বাধীনে দিল্লীর একটি বিদ্যায়তনে তিনি কার্যে ব্রতী হন। পঞ্জাব অত্যাচারের পরে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া সরকার তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। কিন্তু অসহযোগ-আন্দোলন শুরু হইলে সেখান হইতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় সরকার তাঁহার উপর কোনোরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেন নাই। তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ কালে সন্তোষকুমারী নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে অগ্রসর হন। শ্রীরামপুর ফৌজদারী আদালতে তরুণ শ্বেতাঙ্গ হাকিমের নির্দেশে নারীরা অপমানিত হইবার উপক্রম হইলে তিনি ইহাতে প্রবল ভাবে বাধা দেন। শ্রমিকদের সংগঠনেও সন্তোষকুমারী আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সনে বাংলা ও হিন্দীতে তিনি 'শ্রমিক' নামে দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আদর্শ যে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের অনুগ করা হয় তাহারও মূলে সন্তোষকুমারীর হাত রহিয়াছে অনেকখানি।

বঙ্গের নারীগণ সাধারণ ভাবে ও প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যে অবতীর্ণ হন বলিতে গেলে এই অসহযোগের সময় হইতে। এই সময়ে তাঁহারা সাধারণ সভা-সমিতিতে এবং সম্মেলনে সভাপতি পদেও বৃত হইতে থাকেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য-নির্বাহক সভায়ও তাঁহাদের স্থান হইল। নব-গঠিত করপোরেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁহার সময় হইতে করপোরেশনের অধীনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রাইমারী এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার শিক্ষাবিদ্ নাগরিকরূপে ইহাতে অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পৌরসভায় কার্যবিশেষে নারীর যোগদান এই প্রথম। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের মহিলা কর্মীসংঘের বিষয়ও এখানে কিছু বলিব। নারী-কর্মমন্দির উঠিয়া গেলে, নারীদের মধ্যে গঠনমূলক কার্য পরিচালনার জন্য এই সংসদ উহার অব্যবহিত পরেই স্থাপিত হয়। সংসদ কতকগুলি দরিদ্র নারীকে আশ্রয় দান করেন। তাহাদের এবং অন্যান্য মহিলাদের সুতা কাটা ও তাঁত বোনা শিখাইবার ব্যবস্থাও করা হয়। এই সংসদের তত্ত্বাবধানে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় করপোরেশনের অধীন থাকিয়া পরিচালিত হইত। বয়স্থা সদস্যাগণ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া রাষ্ট্রীয় কর্মে সাহায্য করিতেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সাতকড়িপতি রায় সংসদের বৈষয়িক ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিতেন।

বঙ্গকন্যা সরোজিনী নাইডুর কার্যকলাপ সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। ১৯২১ সনে বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই বৎসর আহ্মাদাবাদ কংগ্রেসে দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ সরোজিনীই পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কর্মশক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে ১৯২৪ সনে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক

এবং ভারতীয়দের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সরাসরি ফললাভ না হইলেও, পরবর্তী ১৯২৭ সনে আলাপ-আলোচনার ফলে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে যে গোলটেবিল বৈঠক হয় তাহার মূলে সরোজিনীর অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। ১৯২৫ সনে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিজে অহিংসপন্থী হইলেও, স্বদেশ তথা আত্মরক্ষার্থ স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের জন্য তিনি সভাপতির ভাষণে দেশবাসীর নিকটে আবেদন জানাইয়াছিলেন। ইহার পর, ১৯২৬ সনে তিনি কংগ্রেসের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। বাংলাদেশ পর্যটন কালে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন দেশবন্ধু-ভগিনী শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী। ১৯২৭ সনে সরোজিনী আমেরিকায় গিয়াছিলেন ভারতের সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কথা তথাকার অধিবাসীদের গোচরে আনিবার জন্য।

প্রস্তুতি

অসহযোগ আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ পাওয়া যায় নাই। শাসকশ্রেণীর মতিগতিও তেমন বদলায় নাই। এ কারণ বুঝা গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে অবিলম্বে আর-একটি প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিবে। অসহযোগ দেশের মধ্যে যে ভাব-প্লাবন আনিয়া দিয়াছিল তাহা ধরিয়া রাখিয়া দেশকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভা-সমিতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বাংলার নেতৃস্থানীয়া নারীগণ ইহাতে সমভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি বহু সভা-সমিতি-সম্মেলনের সভানেত্রী রূপেও স্বদেশবাসীর ভিতর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে লিপ্ত হইয়া পড়েন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের নামও স্মরণীয়। এই সময়ে বঙ্গের

নারীদের মধ্যে আত্মসংগঠন ও রাজনৈতিক কার্য পরিচালনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হইল। এই সূত্রে কয়েকটি নারীসংঘ এবং ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসের বিষয় এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব।

দীপালী সংঘ : শ্রীযুক্তা লীলা নাগ ১৯২৩ সনে এগার জন সহকর্মিণী লইয়া এই সংঘ ঢাকা নগরীতে স্থাপন করেন। প্রথমত নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পেই ইহার কার্যারম্ভ হয়। মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি বয়স্কা শিক্ষালয় ও শহরের বিভিন্ন পল্লীতে পনেরোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীপালী সংঘ পরিচালনা করিতেন। এইসকল বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষয়িত্রীরাই শিক্ষাদান করিতেন। বৎসরে একবার নারীদের তৈরী শিল্প-দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হইত। দেশের মনীষী ও নেতৃস্থানীয় বক্তিদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থাও সংঘ করিতেন। ইহা হইতে সম-সাময়িক রাজনীতির আলোচনাও বাদ যাইত না। মেয়েদের সাহস ও শক্তি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা খেলাধুলার নানারূপ ব্যবস্থা হইল। লাঠি-খেলা ও অসি-ছোড়া মেয়েদের শিখানো হইত। ক্রমে কলিকাতায় ও শ্রীহট্টে দীপালী সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা শাখায় শ্রীযুক্তা শান্তি দাস (এখন কবীর) সংঘের অধীনে একটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ পুলিনবিহারী দাস ছাত্রীদের লাঠি-খেলা ও অসি-ছোড়া শিক্ষা দিতেন। ঢাকায় ও কলিকাতায় দীপালী সংঘের অধীন ছাত্রী-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রী-সংঘের সভ্যাদের মধ্যে ছিলেন রেণুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনাদি ব্যাপারে বিখ্যাত) প্রমুখ পরবর্তী কালের রাজনৈতিক কর্মিগণ। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে দীপালী সংঘের কিন্তু কখনো বিশেষ যোগ স্থাপিত হয় নাই। সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা লীলা নাগ ১৯২৮ সনের কংগ্রেসে মাত্র দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে নারীদের ভিতরে আত্মশক্তি তথা আত্মসচেতনতার উদ্বোধন। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে নারীরা

যে কার্য করিতে পারেন, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের অধিকার যে সমতুল, এই কথাই তখন দীপালী সংঘ বাংলার নারীসমাজে বিশেষ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ : নামেই প্রকাশ, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ একটি নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সাইমন কমিশন ১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বপ্রথম বোম্বাই শহরে অবতরণ করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় যে জনসভা হয় তাহাতে সহস্রাধিক বঙ্গনারী উপস্থিত থাকিয়া স্বদেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা এবং শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষের চেষ্টাযত্নে এত অধিক-সংখ্যক মহিলা এই সভায় সমবেত হইতে পারিয়াছিলেন। তখন বাংলাদেশে বিপ্লবী ভাবাদর্শ আবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। ১৯২৭, ১৬ মে সুভাষচন্দ্র বসু আড়াই বৎসর কাল (অক্টোবর ১৯২৪ - মে ১৯২৭) ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে অবরুদ্ধ থাকিবার পর মুক্তিলাভ করেন। সুভাষচন্দ্র খুচরা ত্রাসনকার্যের পরিবর্তে একটি বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মুক্তি আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ভাবাদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইলে দেশের যুবশক্তিকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করা আবশ্যক। এ কারণ নারীদের মধ্যে কাজ করিবার নিমিত্ত তিনি শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষের সাহায্য লইলেন।

শ্রীযুক্তা ঘোষজা মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সভাপতি পদে বৃত হইলেন সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী বসু এবং সহকারী সভাপতি হইলেন শরৎচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী বিভাবতী বসু। বিভাবতী অন্তরালে থাকিয়া স্বামী শরৎচন্দ্র ও দেবর সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহে কতখানি সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি জীবন সায়াহ্নে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন। সংঘের অর্থভাণ্ডার ছিল না, সভ্যদের কোনোরূপ চাঁদাও দিতে হইত না।

এই সংঘের প্রথম দিকে প্রধান কাজ হইল কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে মহিলা কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ বলিয়াছেন, কাজের সুবিধার জন্য কলিকাতাকে দশটি কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। সংঘের সম্পাদক রূপে তিনি প্রতিদিন এই কেন্দ্রগুলির কোনো-না-কোনোটিতে স্বয়ং গমন করিতেন। প্রথমেই উচ্চরাজনীতির কথা না বলিয়া তিনি নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া, তাঁহাদের আনন্দে যোগ দিয়া, অসুখ-বিসুখে সান্ত্বনা দিয়া এবং কখনো কখনো ঔষধাদি ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের সুখদুঃখের অংশী হইতেন। যাঁহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত বিপ্লবাত্মক পুস্তকসমূহ বিতরণ করা হইত। মহিলাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। বিভিন্ন পল্লীর মেয়ে কর্মীদের উপরে ভার ছিল এইসকল পুস্তকে লিখিত বিষয়ের মর্ম তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। ইহাতে বিশেষ কাজও হইয়াছিল। যখনই কোনো বিরাট জনসভার আয়োজন হইত, এইসকল নিরক্ষর পর্দানসীন মহিলা তাহাতে যোগদান করিতে এতটুকু দ্বিধা করিতেন না। সাইমন কমিশন কলিকাতায় পৌঁছিলে যে ব্যাপক হরতাল হয় তাহাতে বেথুন কলেজের ছাত্রীগণ যোগদান করেন। এই সময় বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ জি. এম্. রাইট মহোদয়া ছাত্রীদের সঙ্গে যেরূপ দুর্ব্যবহার করেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই সম্পর্কে কলিকাতায় আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে অধ্যক্ষ রাইট ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এ সময় হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনেও ছাত্রীদের অধিকতর যোগসাধন আরম্ভ হইল।

কলিকাতা কংগ্রেস, ১৯২৮ : এই রকম পটভূমিকার মধ্যে ১৯২৮ সনের মাঝামাঝি হইতেই বঙ্গের নেতৃবৃন্দ দ্বারা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন চলিতে থাকে। সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। এবারকার বাহিনী গঠনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তন্মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সামরিক নীতিতে কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে স্বেচ্ছাসেবকদের ড্রিল

মার্চ ও ডিসিপ্লিন বা নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা। নায়ক অধিনায়ক সহনায়ক প্রভৃতির নামও সামরিক কায়দায় দেওয়া হইল। নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, তথাকথিত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের চেয়ে নিরক্ষর পর্দানশীন মেয়েরাই স্বাধীনতার আহ্বানে আশাতীত রূপ সাড়া দিতে থাকে।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অঙ্গরূপে একটি সেবিকা-বাহিনী গঠিত হইল। ইহাতে বেথুন কলেজের দুই শত ছাত্রী যোগদান করিলেন। এই সেবিকা-বাহিনীর নেত্রী হইলেন শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ। তাঁহার পদের নাম দেওয়া হয় 'কর্নেল'। হাওড়া হইতে পার্কসার্কাসে কংগ্রেস-মণ্ডপ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবিকারা সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর শোভাযাত্রা শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে অনুগমন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তাঁহারা বিশেষ করিয়া মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকদের সুখসুবিধা বিধান করিতে যত্নপর হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, তাঁহাদেরই দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন খাবারের একটি ভাণ্ডারও এবারেই প্রথম কংগ্রেসের সময় খোলা হইয়াছিল। এখান হইতে যে অর্থ আয় হইয়াছিল তাহা পরে কংগ্রেসের কার্যের জন্যই ব্যয়িত হয়।

সামরিক কায়দায় পরিচালিত সুভাষচন্দ্রের এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী লইয়া তখন নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র 'জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং' হইয়াছিলেন। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় 'জি. ও. সি.'। স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী সম্পর্কে অনেকের যে বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না এমন নয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরে যে স্বাধীন-ভারত বাহিনী (যাহা 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ' নামে সমধিক পরিচিত) গঠিত হইয়াছিল তাহা দৃষ্টে মনে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামরিক রীতিতে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন শুধু কথার কথা মাত্র ছিল না। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ একেবারে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছিল। 'রানী অব্ ঝান্সী বাহিনী'র মধ্যেও এবারকার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর পূর্ণ রূপ আমরা লক্ষ্য করি।

কংগ্রেসের পর : কলিকাতা কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী ভাবাদর্শ 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা মারফত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার অবকাশ পায়। মাদারিপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস এবং চট্টগ্রামের সূর্যকুমার সেন ('চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে'র নায়ক, 'মাস্টার-দা' নামে পরিচিত) কংগ্রেসের সময় সুভাষের মনোভাব সম্যক অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যুবশক্তিকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করিতে লাগিয়া গেলেন। এতদিন নারীকে বিপ্লবী কার্যে লওয়া হইত না। এবারে স্থির হয়, সম্ভব হইলে বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণে তাঁহাদের বাধা থাকিবে না। দেশব্যাপী যুবক ও তরুণীদিগকে লইয়া সংঘ গঠনের আয়োজন শুরু হইল; তন্মধ্যে নারীর সহযোগিতা উপেক্ষণীয় নহে। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ শুধু মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের কার্যে বা শুধু তরুণীদের মধ্যে কার্যেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন নাই, তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বা এককভাবে বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি করিয়া যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে তৎপর হইলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শহরে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের মাধ্যমে নারীদের নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলিল। বিভিন্ন স্থানে যেসকল যুবসম্মেলন বা রাষ্ট্রীয় সভা হইত তাহার সঙ্গে মহিলাগণের নেতৃত্বে একটি করিয়া মহিলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইত। ইহার ফলেও নারীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা কম উদ্রিক্ত হয় নাই।

ঢাকার দীপালী সংঘ এই সময় হইতে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। পূর্বোল্লিখিত ছাত্রীসংঘ মারফত তাঁহাদের কার্য আরম্ভ হইল। কলিকাতায় নূতন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ছাত্রীগণ ছাত্রীসংঘ গঠন করেন। ইহার সভাপতি হইলেন শ্রীযুক্তা লীলা রায় (পরে, মজুমদার) এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কল্যাণী দাস (পরে, ভট্টাচার্য)। সংঘের উদ্বোধন-সভায় সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় কংগ্রেস-কার্য পরিচালনের মূল যন্ত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের অনুবর্তীদের প্রাধান্য ঘটে। সুভাষচন্দ্রের অনুবর্তিনী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ কমিটির সদস্য হইলেন। ছাত্রী

ও তরুণীগণ কলিকাতায় এবং মফস্বলে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসুক হন। 'শ্রীসংঘ' নামে একটি বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এ সময়ে। মেয়েরাও ইহা সভ্য ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯২৯ সনে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'পূর্ণস্বাধীনতা' বলিয়া বিঘোষিত হয়। ১৯৩০ সনের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস সর্বপ্রথম উদ্‌যাপিত হইবে বলিয়া ধার্য হইল। সঙ্গেসঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। তবে এখানকার আন্দোলন দ্বিধারায় পরিচালিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা বেশী দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিপ্লবপন্থীরাও যোগ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন অহিংস থাকিতে পারেন নাই। এই দুইটি ধারায় নারীর যোগাযোগের কথাই এখন বলিব।

আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী লবণ-আইন ভঙ্গ দ্বারা আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা সাব্যস্ত করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সবরমতী আশ্রম হইতে ঊনআশি জন সঙ্গী সহ ১৯৩০ সনের ১২ মার্চ পদব্রজে দণ্ডী যাত্রা করেন। পরবর্তী ৫ এপ্রিল লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে তিনি সরকার কর্তৃক দণ্ডীতে বন্দী হইলেন। তিনি ভারতের নারীসমাজের উদ্দেশে এই সময়ে একটি বাণী[১৭]

[১৭] মহাত্মা গান্ধীর এই অমূল্য বাণীর প্রয়োজনীয় অংশের মর্ম এখানে দিলাম :

"এই অহিংস যুদ্ধে পুরুষদের চেয়ে নারীদের দানই অধিক হওয়া উচিত। নারীকে দুর্বল মনে করা অপমানজনক। নারীকে অবলা আখ্যা দিয়া পুরুষ নারীদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

"এই আন্দোলনে লবণ-আইন ভঙ্গ করার চেয়েও বৃহত্তর কার্য আছে। আমি সেই কার্য নির্ণয় করিয়াছি। ১৯২১ সালের এক সময় পুরুষগণ কর্তৃক বিদেশী কাপড় ও মদের দোকানে

রাখিয়া যান। এই বাণীর মূল কথা হইল, নারীরা যেন বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং মাদকদ্রব্য নিবারণকল্পে শান্তিপূর্ণভাবে এগুলির বিক্রয়কেন্দ্রে পিকেটিং করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বাংলাদেশের নারীগণ আইন-অমান্যের অন্যান্য কার্যের মধ্যে এ দুইটি বিষয়েও বিশেষ অবহিত হন। বঙ্গের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তখন অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী দলের প্রভাবাধীন হইলেও, দল-নির্বিশেষে সকলেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিলেন। নারীরাও আপন-পর ভুলিয়া কায়মনে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী বিশেষ করিয়া উক্ত কার্য দুইটি সম্পাদনে লাগিয়া গেলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। বঙ্গীয় কংগ্রেসের একটি প্রধান অংশ তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত। মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ প্রাদেশিক কমিটির অঙ্গরূপে মহিলাদের সঙ্গে কার্য করিতে শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহারা ইতিপূর্বেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। কলিকাতায় এবং মফস্বলে ইহার বিভিন্ন শাখার মারফত আইন-অমান্য কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। কলিকাতায় পর্দানশীন মেয়েরাও দলে দলে সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বিরাট জনসভায় তাঁহারা শিশু-পুত্র-কন্যাসহ বার বার যোগ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। জনসভা শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইলেও, যখনই আইন-অমান্যের উদ্দেশ্যে ঐসকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে তখনই তাঁহারা ইহাতে পুলিসের লাঠি, সামরিক

পিকেটিং আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ঐ আন্দোলনের মধ্যে হিংসা প্রবেশ করায় উহা ব্যর্থ হয়। যদি বাস্তবিক আন্দোলন প্রকৃত সৃষ্টি করিতে হয়, তবে পিকেটিং আরম্ভ করিতে হইবে। যদি উহা শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে, তবে জনগণকে দ্রুত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

"হৃদয়ের দ্বারে নারী ভিন্ন আর কে আঘাত দিতে পারে?... মদ ও মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত হইলে যে নৈতিক চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিদেশী বস্ত্র জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোককে কর্মহীন করিয়া তোলে। ইহার পরিণাম কি তাহা নারী জানেন।

"ভারতের নারীগণ এই দুইটি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বৈশিষ্ট্য অর্জন করুন, তাহা হইলে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের দান পুরুষের অপেক্ষা বেশী হইবে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৩৮

ঘোড়-সওয়ারের আক্রমণ এবং এইরকম নানা উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে যোগ দিয়াছেন। মফস্বলে আইনভঙ্গ করিয়া লবণ প্রস্তুতের কাজে সমুদ্র-নিকটবর্তী মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম— এই কয়েকটি জেলার মহিলাগণও নিজেদের নিয়োজিত করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী আটক হইবার পর, সরোজিনী নাইডু লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এতদিন শোভাযাত্রা জনসভা প্রভৃতি দ্বারা আইন-অমান্য কার্য বেশির ভাগ চলিতেছিল, ইহার পর হইতে মহাত্মাজীর নির্দেশ মত দ্রুত পিকেটিংও জোড় আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্তা অরুবালা সেনগুপ্তের নেতৃত্বে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের কর্মিগণ স্বেচ্ছাসেবিকা-দল গঠন করিয়া কলিকাতার শ্যামবাজার বৌবাজার বড়বাজার অঞ্চলে বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিয়া যান। পিকেটিং বেআইনী। এই বেআইনী কার্যের নিমিত্ত পুলিস প্রথম প্রথম মহিলাদের গ্রেপ্তার না করিলেও পরে যখন ইহা খুব জোরালো হইয়া উঠে তখন নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। বন্দী-সংখ্যা বাড়িয়া গেলে নারীদের গ্রেপ্তার না করিয়া পিকেটিং হইতে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে হয়রান করিতেও ছাড়িল না। ছাত্রীসংঘ রাষ্ট্রীয় সংঘের কার্যে সহায় হইয়াছিলেন। যখন স্কুল-কলেজে পিকেটিং করা ধার্য হইল তখন ছাত্রীসংঘই এই কাজে বিশেষভাবে লিপ্ত হন। তবে তাঁহাদের কার্যে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের নেত্রীবৃন্দও বিশেষ সাহায্য করিতেন। গ্রেপ্তার না করিয়া মহিলাগণকে পুলিস কখনো কখনো কলিকাতার উপকণ্ঠে সাধারণ যানবাহনের অগম্য স্থানে ফেলিয়া আসিতে দ্বিধা করিত না। একবার পুলিস ছাত্রী-সত্যাগ্রহীদের সমস্ত দিন আটক রাখিয়া রাত্রি বারোটা নাগাদ ধাপার মাঠে ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

নারী সত্যাগ্রহ সমিতি : মহাত্মা গান্ধীর দণ্ডী যাত্রার পরদিনই, ১৩ মার্চ ১৯৩০ তারিখে, কংগ্রেসের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্টা কলিকাতার কয়েকজন নেতৃস্থানীয়া মহিলা স্বতন্ত্রভাবে এই সমিতি স্থাপন করিলেন। সভাপতি হইলেন

শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, নিস্তারিণী দেবী, শ্রীযুক্তা আশালতা দাস ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাসগুপ্তা (শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সহধর্মিণী), সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শান্তি দাস (পরে হুমায়ুন কবিরের পত্নী) ও শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী। কার্যকরী সমিতির সদস্যা হইলেন— শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার, অম্বালিকা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, সজ্জন দেবী, মানসনলিনী দেবী ও সুষমা দাশগুপ্তা। নারী সত্যাগ্রহ সমিতিতে কলিকাতা-প্রবাসী অবাঙালী মহিলাদের যোগদান লক্ষণীয়।

সমিতির কার্যক্রম মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের মতই সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পিকেটিং প্রভৃতিতে নিবদ্ধ ছিল। তবে বিদেশী বস্ত্র বর্জনেই ইহার কৃতিত্ব সকলের চেয়ে অধিক। বড়বাজার অঞ্চলের সদাসুখ কাটরা, মনোহর দাস কাটরা, ক্রস্ স্ট্রীট, সুতাপটী, পচাগলি, এবং চাঁদনি, গ্রাণ্ট স্ট্রীট ও হগ মার্কেটে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে সমিতি পিকেটিং পরিচালনা করেন। শত শত নারী— গৃহস্থ ঘরের কন্যা বধূ এবং মাতা— স্বেচ্ছায় সমিতির সভ্যাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাদেরই নির্দেশে পিকেটিঙে লিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে নিরক্ষর, পর্দানশীন, এবং অবাঙালী মেয়েরা বিস্তর ছিলেন। পুলিস পূর্বোক্ত সংঘের মত ইঁহাদের প্রতিও কোনোরূপ সদয় ব্যবহার করে নাই, বরং ক্রমে বহু মহিলাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলে। শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী বলেন, নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সভ্যাগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও অশেষ দুঃখবরণের ফলেই বড়বাজার অঞ্চলের বড় বড় বিলাতী বস্ত্রের আমদানিকারকগণ উহার আমদানি করিতে নিরস্ত হন। ইহার পর বিলাতী কাপড় বাজার হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইল।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার প্রমুখ নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেতৃস্থানীয়া মহিলারা মফস্বলে গিয়াও সত্যাগ্রহ প্রচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মফস্বলে বিভিন্ন জেলায় নারীগণ লবণ-আইন ভঙ্গে লিপ্ত হইয়া পড়েন। মেদিনীপুর বাঁকুড়া ঢাকা কুমিল্লা ও শ্রীহট্টে নারীরা সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য করিতে গিয়া পুলিসের হস্তে নিগৃহীত হন। মেদিনীপুরের কাঁথীতে এই সময় যেসব অনাচার

অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অনুসন্ধানের জন্য উদারনৈতিক নেতা যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে একটি বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করিতে দেন নাই। তবে দিল্লীর আইন-সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী স্বীয় পদাধিকার-বলে রিপোর্ট হইতে যেসকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা দেন তাহা হইতে জানা যায় যে, সরকারী অনাচার হইতে ঐ অঞ্চলের নারীগণও বাদ যান নাই। শ্রীযুক্তা ক্ষেমঙ্করী রায় ও নিস্তারিণী দেবী সহ জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় তমলুক মহকুমার নরঘাটে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডির অত্যাচারের নমুনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, এবং 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকের ১৯৩০ মে সংখ্যায় "Another Crucifixion" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহ সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর হইতে মহিলাগণ কারাবরণ করেন। এই প্রসঙ্গে সত্যবালা দেবী ও মাতঙ্গিনী হাজরার নামোল্লেখ করিতে হয়।

ঢাকার সরমা গুপ্তা ও আশালতা সেন, বাঁকুড়ার সুরমা ও সুষমা পালিত, কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতির নেতৃত্বে সেই সেই স্থানের মহিলারা সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করেন। কুমিল্লার শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ পুলিসের অত্যাচারের প্রতিবাদে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ হইতে শিক্ষয়িত্রী পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের নারীগণ সত্যাগ্রহে যোগদানে সমান তৎপর হইয়াছিলেন। এইরূপে বাংলার দিকে দিকে নারীসমাজ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ পালন করতঃ আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন।

বিপ্লব-কার্য

সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলন নারী-সম্মেলন ছাত্র-সম্মেলন প্রভৃতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীরা যাহাতে দেশমধ্যে স্বাধীনতার মনোভাব ছড়াইয়া দিয়া একটি সত্যকার বিপ্লবের আয়োজন করিতে পারে। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) মামলার কৌসলী ল্যাংফোর্ড জেম্‌স স্পষ্টই

বলিয়াছিলেন যে, ১৯৩০ সনের প্রাক্কালে চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, লতিকা ঘোষ বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠান করিয়া এই বিপ্লবী কার্যে সেখানকার যুবকদের প্ররোচিত করিয়াছিলেন। বস্তুত তখন যুবক ও তরুণীদের মধ্যে দেশের মুক্তির জন্য একটা অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলনে তরুণীগণও যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একদিকে যেমন সরকারী অনাচার ও নিগ্রহ বাড়িয়া যাইতেছিল তেমনি অন্যদিকে তাঁহারা ইহার প্রতিকারার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছিলেন। কলিকাতার শ্রীসংঘ এবং ঢাকার দীপালী সংঘ এই সময় তরুণীদের বিপ্লবী কার্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। ১৩৩৮ সনের বৈশাখ মাসে লীলা নাগের সম্পাদনা ও পরিচালনায় 'জয়শ্রী' নামক মাসিক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হইল। ইহার পরিচালক ও লেখকগোষ্ঠী সমুদয়ই মহিলা। এখানি নারীদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিপ্লব-কার্যের প্রচার শুরু করিয়া দিল।

নারীগণ তাঁহাদের কার্যে অনুশীলন এবং যুগান্তর এই দুই বিপ্লবী দলের কাহারো না কাহারো নিকট হইতে উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়া আসিতেছিলেন। এই দুই দল হইতে ছোট ছোট অংশ শুধু কলিকাতায়ই নহে, ঢাকা চট্টগ্রাম কুমিল্লা বরিশাল প্রভৃতি মফস্বল শহরেও গঠিত হয়। তাহাদের দলে স্কুল ও কলেজের, বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্রীরা প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ছাত্রীগণ নিজ নিজ হোস্টেলে বা মেসে গোপনে ক্লাব স্থাপন করিতেন, বন্ধুদের সঙ্গে নির্দিষ্ট পার্কে মিলিত হইতেন এবং নিজ নিজ দলের আদর্শ অনুযায়ী আলোচনায় লিপ্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা ১৯৩১ সনের পূর্বে কার্যত কিছুই করেন নাই; অবশ্য কেহ কেহ বিপ্লবী যুবকদের অস্ত্র সংগ্রহ ও আদান-প্রদানে সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় বীণা দাস (এখন ভৌমিক), কুমিল্লার শান্তি ঘোষ (এখন দাস) ও সুনীতি চৌধুরী, চট্টগ্রামে কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বরিশালে প্রথম মহিলা ঈশান-স্কলার শান্তিসুধা ঘোষ এবং আরও অনেক তরুণী নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিপ্লবী কার্যে অগ্রসর হইলেন।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে সুভাষচন্দ্রের ভাবাদর্শ অনুযায়ী কাজ হওয়ার আর সম্ভাবনা ছিল না। সরকার বিপ্লবীদের দমনে কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন। পূর্বে কেহ ভাবিতেও পারে নাই যে, তরুণী ও অল্পবয়স্কা ছাত্রীরাও এরূপ কার্যে কখনও লিপ্ত হইবে। তাই যখন কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট-হত্যার সংবাদ প্রচারিত হইল তখন সকলেই হকচকিয়া গেল। কুমিল্লার বালিকা-বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী যোড়শবর্ষীয়া শ্রীমতী শান্তি ঘোষ এবং চতুর্দশবর্ষীয়া শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১ সনের ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ছলে তাঁহাকে গুলি করেন। গুলির আঘাতে ষ্টিভেন্স সেখানেই মারা যান। শান্তি ও সুনীতিকে তখন-তখনই গ্রেপ্তার করা হইল। কলিকাতায় স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁহারা অল্প-বয়স্ক বিধায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ষ্টিভেন্স-হত্যার পনের দিনের মধ্যেই দীপালী সংঘের লীলা নাগ এবং তাঁহার কলিকাতা ও ঢাকার সহকর্মিগণ ধৃত হইয়া রাজবন্দীরূপে (detenue) আটক হইলেন। সন্দেহবশে মেয়েদের আটক করা এই বোধ হয় প্রথম। সংঘের মুখপত্র 'জয়শ্রী'ও বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের ওজুহাতে সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, 'জয়শ্রী' পরেও বহু বার এইরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন সম্পাদিকাগণ অনেকে কারাবরণও করিয়াছিলেন।

কুমিল্লার ব্যাপারের পর মাত্র দুই মাসের মধ্যেই কলিকাতায়ও মহিলাদের দ্বারা বিপ্লবী কার্য সংঘটিত হইল। ১৯৩২ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। সুধীমণ্ডলীর মধ্যে চ্যান্সেলার রূপে গবর্নর জ্যাকসন উপবিষ্ট। উপাধি-বিতরণ কালে বি-এ উপাধিধারিণী বীণা দাস জ্যাকসনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। অল্পের জন্য গুলি লক্ষ্যবিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইহা লইয়া শুধু সমাবর্তনস্থল—সিনেট হাউসেই নয়, শহরময় ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, বীণা দাসকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। সরাসরি বিচারে তাঁহার নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। ইহার পর হইতে

বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত সন্দেহে বহু মহিলাকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কেহ কেহ বিপ্লবী কার্য করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইলেন। এই শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে কমলা চট্টোপাধ্যায়, শোভারাণী দত্ত, উজ্জ্বলা দেবী, পারুল মুখোপাধ্যায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, মায়া দেবী, জ্যোতিকণা দাস, বনলতা দাস, রেণুকা সেন, প্রফুল্ল ব্রহ্ম প্রভৃতিও ছিলেন। বরিশালের শান্তিসুধা ঘোষ 'গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক কেস' নামক রাজনীতিক ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন। তিনি ঐ মামলা হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় বঙ্গীয় ফৌজদারি আইন অনুসারে বরিশালে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে'র পরে চট্টগ্রামে বিপ্লবী দল ও সরকারের মধ্যে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শক্তি-পরীক্ষা চলিতেছিল। সরকারী অত্যাচার উৎপীড়ন নিগ্রহের অবধি ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বিপ্লবীরা নিজ কার্য চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কার্যে তথাকার নারীরাও অনেক বিষয়ে সহায় হন। আর এজন্য তাঁহাদের কম পীড়ন সহ্য করিতে হয় নাই। চট্টগ্রামের নারী বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কল্পনা ১৯২৯ সনেই চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু ১৯৩১ সনের পূর্বে প্রীতি ইহাতে কার্যত যোগদান করেন নাই। এই সনের জুন মাসে তিনি চট্টগ্রাম-বিপ্লবী দলের নেতা 'মাস্টার-দা' বলিয়া পরিচিত সূর্যকুমার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কল্পনা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে পুরুষের ছদ্মবেশে গমন কালে ধৃত হন। পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া ফেরারী হইয়াও তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। ১৯৩৩ সনে বিশেষ ট্রাইবুনালে সূর্যকুমার সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে কল্পনার বিচার হইল। প্রথমোক্ত দুই জনের ফাঁসির হুকুম হইল। নারী ও অল্পবয়স্কা বলিয়া কল্পনার হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সূর্যকুমারের সংস্পর্শে আসেন ১৯৩২ সনের মে মাসে। তিনি অল্পকালের মধ্যে অসীম ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৩২ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলী আক্রমণে

নেতৃত্ব করিতে গিয়া প্রীতিলতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। শত্রুহস্তে পড়িবার আশঙ্কায় তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খাইয়াছিলেন। প্রীতিলতা সূর্যকুমারের সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বেই বিপ্লবী ভাবের ভাবুক হন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলীপুর জেলে চল্লিশ বার তিনি 'ভগিনী' বলিয়া পরিচয় দিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বি-এ ক্লাসের ছাত্রী। চট্টগ্রাম—ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী বৃদ্ধা, নিরক্ষরা। তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয়-দানের ওজুহাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হন। তাঁহাকে কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছিল। চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়া সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায় অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন। চট্টগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী অনন্ত সিংহের ভগিনী ইন্দুমতী সিংহকেও ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সুহাসিনী ও ইন্দুমতীকে সরকারের কারাগারে আটক থাকিতে হয়।

কর্তব্য ও দায়িত্ব

শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে শহর ও পল্লীবাসিনীরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় কায়মনে যোগ দিতে থাকেন। কংগ্রেসের উচ্চতম কর্ম-পরিষদে সরোজিনী নাইডু ১৯২৫ সন হইতে সদস্যরূপে কার্য করেন। ১৯৩১ সনের গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পক্ষে লণ্ডনস্থ দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যখন যোগদান করিয়াছিলেন তখন সরোজিনী নাইডু ভারতীয় নারীসমাজের মুখপাত্রী স্বরূপ উহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়া যান। ১৯৩২ সনে দ্বিতীয় আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও বঙ্গনারীগণ অনেকে কারাবরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ১৯৩৩ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। এ অধিবেশন নামেমাত্র হইতে পারিয়াছিল। এই বৎসরেই (১৯৩৩) জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কুমুদিনী বসু স্বদেশ-সেবা তথা রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-

কল্যাণ কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ করপোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারও করপোরেশনের অল্‌ডারম্যান হন।

১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী নারীদের ভোটাধিকার-ক্ষমতা প্রসারিত হইল। বিভিন্ন ব্যবস্থা-পরিষদে একমাত্র নারীদের ভোটে নারী-সদস্য নির্বাচিত হইবার অধিকার এবারে পাওয়া গেল। এই আইন অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইল ১৯৩৭ সনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। অন্যান্য নারী-কেন্দ্র হইতেও নারীগণ যথারীতি নির্বাচিত হইয়া আসেন। কংগ্রেস এগারোটির মধ্যে ছয়টি প্রদেশে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তবে অল্পকাল ব্যবধানে আটটি প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম হন। মন্ত্রীসভায় কোনো কোনো প্রদেশে মহিলা-মন্ত্রী স্থান পাইলেন, কোনো কোনো ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহারা স্পীকার বা ডেপুটী-স্পীকার হইলেন। কিন্তু বঙ্গে কংগ্রেস সংখ্যালঘু থাকায় নারীর পক্ষে এরূপ কোনো পদাধিকারের সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তাঁহারা সংগঠন-কর্মের মধ্যে নিজ পথ খুঁজিয়া লইলেন।

একথা বলিবার পূর্বে আর একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হয়। বাংলাদেশের বহু যুবক ও তরুণী আইন-অমান্য আন্দোলনের পর হইতে বিপ্লবাত্মক কর্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বিনা বিচারে বন্দী বা আটক হইয়াছিলেন। আবার অনেকে বিচারালয়ের বিচারে দীর্ঘকালের মেয়াদে কারাদণ্ডও ভোগ করিতেছিলেন। নূতন আইন প্রবর্তনের (এপ্রিল ১৯৩৭) কিছুকাল পরেই মহাত্মা গান্ধী বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার মন্ত্রীসভায় মুসলমান দলের প্রাধান্য। রাজবন্দী ও কারাদণ্ডিত বন্দীদের মুক্তিদানকল্পে মহাত্মাজী তাঁহাদের এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছুকাল আলাপ-আলোচনায় রত থাকেন। ইহার ফলে উভয় শ্রেণীর বন্দী প্রায় সকলেই একে একে খালাস পাইলেন। নারীবন্দিনী ও কারাদণ্ডিতারাও এই সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে, নারীদের এবং বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লব-আন্দোলনে লিপ্তা ও দণ্ডিতা শ্রীযুক্তা কল্পনা দত্তের কারামুক্তির ব্যাপারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দীনবন্ধু সি. এফ. অ্যানড্রুজও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল মহিলার কেহ কেহ তাঁহাদের বিপ্লবী কার্যের ও কারাবাস-কালের কাহিনী লইয়া ইদানীং পুস্তকাদি লিখিয়াছেন।

মুক্তিলাভের পর বহু মহিলা বিপ্লবী কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ নারী কর্মীরা কংগ্রেসেরই আশ্রয়ে 'কংগ্রেস উইমেন্স লীগ' প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের সংগঠন কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করা। প্রাদেশিক এবং নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেও তাঁহারা অধিক সংখ্যায় স্থান লাভ করিলেন। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বকালে কংগ্রেস দেশের বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' বা জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন। ইহাতে নারীদের স্থানও সুনির্দিষ্ট ছিল। শ্রীযুক্তা লীলা রায় (পূর্বেকার লীলা নাগ) ইহার নারী সাব-কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের শাখা-কমিটির আহ্বায়কও ছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বার (১৯৩৯) কংগ্রেস-সভাপতিত্ব লইয়া বিরোধ বাধিলে, শ্রীযুক্তা লীলা সুভাষচন্দ্রেরই অনুবর্তী রহিয়া গেলেন। সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিলে লীলা রায় প্রমুখ তাঁহার অনুসরণকারীগণ ইহাতে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল হইয়া যায় এবং কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহারা 'অ্যাড হক কমিটি' গঠন করেন। এইবারে নারীগণ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া কেহ কেহ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে পুরাতন কংগ্রেস কমিটির সহিত যুক্ত রহিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও শ্রীযুক্তা লীলা রায় বিশেষ প্রভাবশালিনী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ভারত-ত্যাগের (জানুয়ারী ১৯৪১) পর হেমপ্রভা বাতিল কংগ্রেস কমিটির 'ডিক্টেটর' বা 'সর্বাধিনায়ক' হন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে যোগ্য সহকর্মী

রূপে পাইয়াছিলেন। সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় সভা-সমিতিতে তাঁহার সঙ্গে লীলা রায়ও প্রায়ই যোগদান করিতেন। ১৯৪০, ২ জুলাই 'হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ'-বিদূরণ সম্পর্কীয় আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র ধৃত হইলে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের উপর পতিত হইল। উক্ত আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। কুড়ি জন সহকর্মীর সঙ্গে শ্রীযুক্তা রায় প্রেসিডেন্সী জেলে 'নিরাপত্তা বন্দী' হন। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগের পরে রায়-মহোদয়া সমগ্র ভারতে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে তৎপর হন। দ্বিতীয় মহাসমর কালে সুভাষচন্দ্রকে সরকারপক্ষীয়েরা 'ফাসিস্ট' বলিয়া আখ্যাত করায় রায়-জায়া সংবাদপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার উপযুক্ত জবাব দেন। ১৯৪২ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবন্দী করা হইল। পূর্বোক্ত 'অ্যাড হক কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া শ্রীযুক্তা বীণা দাস প্রমুখ মহিলাগণ কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। 'অ্যাড হক কমিটি' ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরও তিনি সদস্য হন।

আগস্ট-বিপ্লব ১৯৪২

অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ছাপাইয়া যায় ১৯৪২ সনের আগস্ট-বিপ্লব। এই বৎসরের ৭ ও ৮ আগস্ট তারিখে বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ দেশ হইতে চলিয়া যাউক, আমরা যুদ্ধকার্যে তাঁহাদিগকে কোনোমতেই সাহায্য করিব না, আমরা আত্মশক্তির উপর দাঁড়াইয়া বিপক্ষদলের সঙ্গে লড়িব। বলা বাহুল্য, মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি ৮ তারিখে গৃহীত হইবার পরই রাত্রিশেষে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ বহু নেতা সরকার

কর্তৃক আটক হইলেন। তাঁহাদিগকে অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। ইহার দুই-এক দিনের মধ্যে ভারতের সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হইল এবং নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী মাত্রেই কারাবদ্ধ হইলেন। মহিলা নেত্রীগণও ইহা হইতে বাদ পড়িলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র নারী সদস্যা সরোজিনী নাইডু প্রথম দিনেই মহাত্মাজীর সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। এই সময় সমগ্র ভারতব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা-আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহাই পরে 'আগস্ট-বিপ্লব ১৯৪২' নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের সর্বত্র এই বিপ্লব ছড়াইয়া পড়িলেও মেদিনীপুরেই ইহা নিবিড় ভাবে আরম্ভ হয়। এই জেলার তমলুক অঞ্চলে ও কাঁথিতে 'জাতীয় সরকার' স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলিয়াছিলেন, 'মেদিনীপুরে ব্রিটিশ শাসন অন্তর্হিত হইয়াছে।' মেদিনীপুরে নারীগণ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মাতঙ্গিনী হাজরার নামোল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি। বার্ধক্য হেতু তিনি 'গান্ধী-বুড়ী' নামে তখন আখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি পল্লী হইতে তমলুক শহরে আগত একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা-কালে সৈনিকের গুলিতে নিহত হন।[১৮] তখন তাঁহার বয়স তিয়াত্তর বৎসর।

১৮ এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :

"From the north, entered another procession under the leadership of the veteran congress worker Sm. Matangini Hazra, aged 73. They encountered the soldiers under the command of Sj. Anil Kumar Bhattacharyya. They had to withdraw to some distance on being attacked by the soldiers at the narrow entrance by the side of the 'Ban Pukur.'···Then our soldiers of freedom led by Sm. Matangini Hazra again encountered the Government troop, who opened fire and continued showering bullets for a long time. Sm. Matangini held the National Flag firmly and advanced. The Government troop first hit her on both hands. Her hands dropped, but not the National Flag, which she still held tight and advanced, requesting the Indian troop to cease firing and to give up the jobs and join the Freedom Movement. She received a reply—a bullet which ran right through the forehead and she fell dead.

মৃত্যুকালেও জাতীয় পতাকা তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই। মেদিনীপুরের আরও বহু মহিলা সৈনিকের গোলাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া মৃত্যুপণপূর্বক আহত জাতীয় কর্মীদের সেবায় রত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ন্যায় বীরভূমের অন্তর্গত শান্তিনিকেতন অঞ্চলেও মহিলা কর্মীরা আগস্ট-বিপ্লবকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে প্রচার ও গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা নন্দিতা দেবী এবং শ্রীযুক্তা রানী চন্দ এই অঞ্চলে বিপ্লবে যোগদান হেতু কারারুদ্ধ হইলেন। শ্রীযুক্তা চন্দ কারাবাসের কাহিনী একখানি পুস্তকে[১৯] মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এদিকে কলিকাতায়ও বিপ্লব জাঁকিয়া উঠার সঙ্গেসঙ্গে বহু নারী কারারুদ্ধ হইলেন। দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্তা বীণা দাস (এখন ভৌমিক) কারাগমন করিলেন। কংগ্রেস-নেতারা প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ বা আটক হইলেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত 'অ্যাড হক' কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। আগস্ট-বিপ্লবে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সমাজতন্ত্রী দলেরও কৃতিত্ব কম নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস-বহির্ভূত দল হইলেও বিপ্লবের আদর্শ তাঁহারা বহু পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারাও ইহাতে যোগ দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সমাজতন্ত্রী দল কিন্তু তখন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা পুলিস ও সেনাবাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া সংগোপনে বিপ্লব-কার্য চালাইতে লাগিয়া যান। এই দলের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রধানা ছিলেন শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী। তিনিও একজন বঙ্গমহিলা, তাঁহার পিতৃনিবাস বরিশালে। বিবাহের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইলে

As she lay there in the dust sanctifed by her blood, the National Flag was still in her grip, yet flying unsullied." —*August Revolution* : *Two years' National Government* : *Midnapur*, pp. 22-3.

১৯ জেনানা ফাটক

তিনি পুলিসের হাতে ধরা দেন নাই। তাঁহার সহোদরা উত্তর-প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী পরলোকগতা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুলিসের চক্ষে ধুলা দিয়া বাংলাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীযুক্তা অরুণা সমাজতন্ত্রী-নেতা ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে গোপনভাবে 'ইন্‌কিলাব' ('বিপ্লব') নামক একখানা সংবাদপত্রও সম্পাদন করিতেন। সহোদরা পূর্ণিমা সহ তিনি ছদ্মবেশে বাংলা ও আসাম বারবার পরিক্রমা করেন।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারি নাগাদ শ্রীযুক্তা অরুণার উপর হইতে পরোয়ানা তুলিয়া লওয়া হয়। তিনি সর্বপ্রথম কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কের বিরাট জনসভায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই দিনের বক্তৃতায় তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কলিকাতায় মৃত ও মুমূর্ষু নারী এবং শিশুর যে মর্মন্তুদ বর্ণনা দেন তাহা অনেকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ডাঃ শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধান্বিতা। তিনি আগস্ট-বিপ্লবকালে অর্থসংগ্রহ দ্বারা কংগ্রেসকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত তিনি যুক্ত রহিয়াছেন। এই যুগে কয়েকজন প্রবাসী কৃতী বঙ্গকন্যার নামও উল্লেখ করিতে হয়। উড়িষ্যার বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ চৌধুরীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী আগস্ট-বিপ্লবকালে বিশেষ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি কিছুকাল উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির আসনও অলংকৃত করিয়াছিলেন। আচার্য কৃপালনীর পত্নী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী এবং শ্রীযুক্তা আশা অধিকারীর (এখন আর্যনায়কম্) কার্যকলাপও আমাদের ভুলিবার নয়। এমন বহু মহিলা আগস্ট-বিপ্লবে আত্মদান করিয়াছেন যাঁহাদের কথা আমাদের জানা নাই। তাঁহারাও আমাদের নমস্য।

আগস্ট-বিপ্লবের পরে

আগস্ট-বিপ্লব দমনে সরকারের বিশেষ সুবিধা হইল। তখন যুদ্ধকার্যের জন্য বঙ্গের নানাস্থানে ঘাঁটি করিয়া সৈন্যসামন্ত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবার

পুলিসের সঙ্গে সামরিক শক্তিও উহা দমনে প্রযুক্ত হয়। এই বিপ্লব দমনে কর্তৃপক্ষ মেদিনীপুরের ঝড়ের মত নৈসর্গিক বিপর্যয়ের সুবিধা লইতেও ক্ষান্ত হন নাই। ইহার উপর আসিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। ইহাকে যে 'man-made' বা মনুষ্য-কৃত দুর্ভিক্ষ বলা হইয়াছে তাহার মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পূর্ব হইতেই বাংলার পূর্বাঞ্চল হইতে যানবাহন সরাইয়া লওয়া হয়। খাদ্যশস্য এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাইতে না পারায় এবং ইহা যাহাতে শত্রুর হস্তগত না হয় সে উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে মজুত করিয়া রাখায় বাংলায় ভীষণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল, ফলে হইল ১৩৫০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে কুখ্যাত হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নর-নারী-শিশু ইহাতে জীবন আহুতি দিয়াছে। সেবাকার্যে যাঁহারা কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই তাঁহারা এই সময় প্রায় সকলেই জেলে।

দুর্ভিক্ষে বাংলার নারী ও শিশুর দুর্গতি হইল অশেষ। কলিকাতাস্থিত কতিপয় মহিলা কর্মী এই সময় ইহাদের রক্ষাকল্পে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। নাম দিলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। কলিকাতায় ও মফস্বলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবাকার্যও অবিলম্বে আরম্ভ হইল। এই শাখা-সমিতিগুলি অনশনক্লিষ্টা নারী ও শিশুর মুখে অন্ন পৌছাইয়া দিবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। নারীর সমাজ-জীবনে এই সময় যে ভীষণ সংকট উপস্থিত হয় তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করার ভার লইলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

বঙ্গনারীর আত্মরক্ষা বা আত্মশক্তির উদ্বোধনমূলক আন্দোলন আর একটি বিষয় হইতে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপান-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থল সিঙ্গাপুরে একটি অস্থায়ী জাতীয় ভারত-গবর্নমেণ্ট স্থাপন করেন। ইহার অধীনে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি জাতীয় সামরিক বাহিনীও

গঠিত হইল। ইহার অন্তর্গত এক-একটি অংশের নাম দেওয়া হইল— গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড প্রভৃতি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রও নারীকে যথাযোগ্য স্থান দিতে কখনও দ্বিধা-বোধ করেন নাই। তিনি ঝান্সীর রানীর নামানুসারে 'রানী অব ঝান্সী ব্রিগেড' নামে নারী-বাহিনী গঠন করিলেন। এই বাহিনীর নায়িকা হইলেন শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। যুদ্ধ-পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা এই বাহিনীকে দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নারীজাতির এই সম্মান শুধু বাংলা কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নারীগণের মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আনিয়া দিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বিদেশী শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই সমিতি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'যে লক্ষ্য নিয়ে রাজপুত নারী জহরব্রত সফল করতেন সেই একই লক্ষ্য এদের ছিল। বহিঃশত্রুর হাতে আপনার মান মর্যাদা ইজ্জৎ বিসর্জন না দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার প্রতিজ্ঞা ছিল।'

দ্বিতীয় মহাসমর থামিয়া যাইবার (মে ১৯৪৫) পূর্ব হইতেই কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ও সেবকগণ একে একে কারামুক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম যেন রূপবন্ত হইয়া জাতিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। ছোটবড় নানা ব্যাপারের ভিতর দিয়াই ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারকালে দেশব্যাপী যে আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ভারতবাসী আর বিদেশী শাসন মানিয়া লইতে রাজী নয়। বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহও ইহারই দ্যোতক। সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা-হরতাল বাংলা-দেশে কলিকাতায় ও মফস্বলে হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বাংলার নারীগণও ইহাতে সমানভাবে যোগদান করিলেন। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা এখানে বিশেষভাবে বলি। একদিন

ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শোভাযাত্রা ধর্মতলায় আটক রাখা হয়। তাহাদের মাতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সারারাত্রি তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া নানারকম উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর পুনরায় হরতালের সময় দক্ষিণ-কলিকাতায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় তাহা নিবারণ-কল্পে জ্যোতির্ময়ী সেখানে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় পিছন হইতে পলায়নরত জিপগাড়ির ধাক্কায় তিনি ভীষণরূপে আহত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। দেশ-মাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন তিনি মরণেই দান করিয়া গেলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল ইহার পরিচালনার দরুন ইংরেজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ভারতবর্ষকে স্বাধিকার-প্রদানে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার সময় তাহার ভেদনীতিকে সার্থক করিয়া রাখিয়া গেল। ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থান— ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট হইতে ভারতবর্ষ এই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে নারী নিজেকে কখনও পুরুষ হইতে আলাদা করিয়া ভাবেন নাই। নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টাতেই আমরা জাগতিক সকল কর্ম নির্বাহ করিয়া থাকি। আমাদের জাতীয় আন্দোলনেও নারী যখন পুরুষের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দাঁড়াইলেন তখনই তাহা শক্তিমান হইয়া উঠিল। এই শক্তি রোধে কাহার সাধ্য? শেষপর্যন্ত বিরাট ব্রিটিশ-রাজ্যকেও 'স্বর্ণখনি' ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। ভারতবাসী আপামর সাধারণ ইংরেজ শাসনের প্রতি যে বিরূপ হইয়া উঠে, তাহার মূলে বাংলার তথা ভারতের নারীসমাজের কৃতিত্বের তুলনা নাই। ১৯০৬, ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৪২— আমাদের জাতীয় আন্দোলনে এই কয়টি সন স্মরণীয়। প্রথমে পরোক্ষে এবং পরে সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিয়া ইহার প্রত্যেকটিকেই বঙ্গনারী সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

——

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

ভ্রম-সংশোধন

পৃ. ২ পাদটীকা : "India Wrought for Freedom" স্থলে *How India Wrought for Freedom* হইবে।

পৃ. ১৫ পংক্তি ৪ : 'জেম্‌স ম্যাকডোনাল্ড' স্থলে 'জেম্‌স র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড' হইবে।

পৃ. ২৪ " ১০ : 'মহিলা কর্মীসংঘের' স্থলে 'মহিলা কর্মীসংসদের' হইবে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১।।০

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১।।০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১।।০

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২।।০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ ২।।০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲